চম্পার মায়ের ডায়রী

শহিদ হোসেন খোকন
sayansg@singnet.com.sg

চম্পার মা যেখানেই থাকুন না কেন বছরান্তে একবার ডাইরীর খোঁজে আমাদের অফিসে হাজিরা দেবেন আর ফোনে নানা সময় খোঁজ খবর নেবেন। যখন ফোন করেন পরপর দু-তিন দিন কথা বলেন তারপর হয়তো দু'মাস কোন সাড়া শব্দ নেই আবার ফট করে একদিন চম্পার মায়ের কণ্ঠ - কেমন আছেন শরীর স্বাস্থ্য ভাল বৌ বাচ্চা সব ভাল?..... ইত্যাদি নানা কুশল জিজ্ঞেস করার পর হয়তো বলবেন মাদ্রাজ যাওয়ার ভাড়া এখন কত, ভাল একটা হোটেল কি পাওয়া যাবে? কখনো যাইনি তো ! বয়স হয়েছে সেফটির কথাটা আগে ভাবা দরকার। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স সেফ না কি বলেন, ভাড়া যেন কত? কিছু ওয়ার্কার আনার কন্ট্রাক পেয়েছি তো একবার না গেলেই নয়.....

এ রকম কথা শুনলে যে কেউ লাফিয়ে উঠবে ব্যবসা বাগানোর জন্য হৃদপিন্ডে রক্তপ্রবাহ বেড়ে যাবে। আমি কুল থাকি জানি এটা মাদ্রাজি ভুত, দুদিন পর আপনাতেই পালাবে। তারপর আসে মদিনা ভুত - চম্পার মা হজ্জ করতে যাবেন হজ্জের ডিল বড় শক্ত ডিল; কোটা থাকে, ভিসার ব্যাপার স্যাপার থাকে, টুইন শেয়ারিং প্যাকেজ নিতে হয়, হোটেল খুঁজতে হয় পদে পদে ঝক্কি এর চেয়ে জোহান্সবার্গ যাওয়া অনেক সহজ। একবার তো চম্পার মায়ের হজ্জে যাওয়ার ডিল প্রায় ফাইনালই করে ফেললাম, পেমেন্টের জন্য তাগদা দিতেই চম্পার মা বলে আমি তো খাট থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলেছি এখন যাই কি করে শুনেছি ওখানে নাকি অনেক হাঁটাহাঁটির ব্যাপার স্যাপার আছে আমার পায়ে তো প্লাষ্টার তিন মাসের আগে খোলা যাবে না।

আজও এসে ফ্রান্স জার্মানী ইটালী নানা রুটের ভাড়া জিজ্ঞেস করে আমার ঘাম বের করে ফেললেন, আমার ভাগ্য ভাল আমারিকায় ঢুকেননি আমেরিকার ৫০ টা স্টেট ডোমেস্টিক মিলিয়ে পঞ্চশ রকম এয়ারলাইন্স, ভাড়া বের করতে ৫০ রকমের ঝক্কি। ইভেনচুয়েলি যখন চম্পার মা জিঙ্গেস করলেন - ঢাকা যাবার ভাড়া কত? আমার ঘাম দিয়ে জ্বর সারল আমি তাকে বিমান, থাই এয়ারওয়েজ, সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের ফেয়ারগুলো দিয়ে বললাম - যখন যেতে চান বলবেন সবচেয়ে সস্তায় যে ডিল থাকবে সেটাই আপনাকে দেব। তারপর মনে মনে বললাম - ইউরোপ আমেরিকা সৌদিআরব ত অনেক দূর তুমি বেটি ঢাকা পর্যন্ত যাইবা কিনা সন্দেহ খামাখা বিরক্ত কর...পাঁচ বছর ধইরা দেখতাছি তোমার তামাশা।

চম্পার মা বললেন - আপনার কি ধারনা আমি তামাশা করি ? তামাশা না, সারাক্ষণ ঢাকায় যেতে মন চায় কিন্তু কার কাছে যাব বলেন ! আমার যে বোনটা ছিল সেও গত মাসে মারা গেছে.....

চম্পার মা'র চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে থাকে। আমি বেশ আঁৎকে উঠি মহিলা আমার মনের কথা টের পেলেন কি করে ! চোখে পানি দেখে আমি খুব বিব্রত বোধ করি, ভেতরে একটা অপরাধবোধ কাজ করে - আহা ঢাকায় কেউ না থাকলে তিনি যাবান কার কাছে ? তা-ছাড়া খরচ পত্রেরও একটা ব্যাপার আছে বিমান ভাড়া আর টুকটাক শপিং মিলিয়ে হাজার তিনেক ডলারের ধাক্কা - বুড়ো বয়সে এতো টাকা তিনি পাবেন কোথায় ! ভেতরের অপরাধবোধটাকে জুতাপেটা কারার জন্যে শামসুকে চা আনতে বলি তারপর জিজ্ঞেস করি - কি হয়েছিল আপনার বোনের ?

আমার প্রশ্ন শুনে থেমে আসা অশ্রু আবার গড়াতে শুরু করে, নিজের বোকামীর জন্যে নিজের ওপরই রাগ হয়। অফিসে কান্নাকাটি একটা বিসদৃশ ব্যাপার। ভাগ্যিস অফিস আজ একেবারেই ফাঁকা, নয়তো অন্য কাষ্টমাররা মনে করতো চম্পার মাকে আমরা বোধহয় কোন ঝামেলায় ফেলেছি - কষ্টমাররা হলো মাছের মতো, ঝাঁক বেঁধে চলে। একজন গোত্তা খেয়ে অন্যদিকে চলতে শুরু করলে সবাই পেছন পেছন ছুটতে শুরু করে।

আমাদের ব্যবসা মন্দ চলছে না, কষ্টমার সার্ভিস ভেরি ইনপরটেন্ট সবকিছু খুব কেয়ারফুললি ডিল করতে হয়,

একটা কেস মিস-হেন্ডলিং হলে ভয়াবহ বিপদ। মাছের মতো সবাই গোত্তা মেরে অন্য কোথাও ভিড় জমাবে। ব্যবসা আর রাজনীতির মোদ্দা কথা হলো পিপল - জনগণ মুখ ফিরিয়ে নিলে নির্ঘাত লালবাতি।

চম্পার মা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলেন - আমার বোনকে আপনি তো দেখেছেন, সেই যে গত বছর আমার শাড়ি আর ব্লাউজ নিয়ে গেলেন....

আমি চমকে উঠে আশে পাশে তাকাই - শাড়ি-ব্লাউজের কেরিয়ার হওয়া প্রাউড হবার মতো কোন ব্যাপার না, তা ছাড়া ওটা একটা ভয়াবহ ঘটনা মনে পড়লেই আমার গায়ে জ্বর আসে। ঠিক গত বছর নয় এ বছরই জুনের ঘটনা সেটা - চম্পার মা একদিন হন্তদন্ত হয়ে আমাদের অফিসে ঢুকে বলল এই প্যাকেটে আমার একটা শাড়ি আর দুইটা ব্লাউজের কাপড় আছে, শাড়িতে জরির কাজ হবে আর আমার একটা ব্লাউজের মাপে দুইটা ব্লাউজ হবে।

চম্পার ময়ের বয়স হবে ষাটের কাছাকাছি, চুলে পাক ধরেছে ডাই করেও আড়াল করা যাচ্ছে না। এ বয়সে মাথায় একটা এলোমোলো ভাব আসে করিমকে রহিম বলে ভ্রম হয়। আমাদের হলো ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসা তিনি সম্ভবত 'মাষ্টার টেইলার' ভেবে এখানে শাড়ি ব্লাউজ নিয়ে এসেছেন। আমি এরকম আশংকা প্রকাশ করতেই চম্পার মা হেসে কুটিকুটি...অসাবধানতায় তার উপরের পাটির ফলস টিথ প্রায় খুলে উপক্রম।

হাসি থামিয়ে তিনি বললেন - এগুলো ঢাকায় আমার বোনের কাছে পাঠাবো ও বানিয়ে দেবে....এখানকার টেইলারগুলো বুঝলেন মহা বজ্জাত - ব্লাউজ প্রতি বিশ ডলার চার্জ করে তারপর বুকের কাটা এমন বড় করে রাখে বিচ্ছি ব্যাপার.....

আমি মনে মনে বলি - সত্যিই তো বুড়ো মানুষের বুকের কাটা বড় করে দেয়া বিরাট বজ্জাতি, যুবতি হলে ভিন্ন কথা। এখানকার যুবতীদের আবার রাখ-ঢাক কম এরা নিজের সৌন্দর্য উন্মোচন করে আনন্দ পায়। ছোট ছোট জামা-কাপড় পড়ে বুক ফুলিয়ে হাঁটে, প্যান্ট এমন নীচে পড়ে মনে হয় এখনই বুঝি খুলে যাবে। টেইলার এবং ফ্যাশন ডিজাইনাররা নারীদেরকে উন্মোচনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে চায় না। এদের কল্যাণে আমাদের মতো আম-জনগণের আনন্দও কম নয়। মনে যাই ভাবি না কেন চম্পার মাকে মুখে বলি - এদেশে গরম বেশী তো তাই ওরা একটু খোলামেলা পছন্দ করে, কি আর করবেন যার যা রীতি আপনি বরং এক কাজ করুন ওগুলো কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিন দ্রুত পৌঁছে যাবে।

চম্পার মা বললেন - কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠানো অনেক খরচান্ত ব্যাপার ডি এইচ এলে পাঠালে খরচ পড়বে আশি ডলার। আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য হলো আপনাদের চেনা শোনা অনেক লোক তো ঢাকায় যাওয়া আসা করছে রিলায়েবল কাউকে দিয়ে এগুলো আমার বোনের বাসায় পৌঁছে দিলেই হবে ঠিকানা প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে। ওরা শান্তি নগরে থাকে।

২ সপ্তাহ ধরে চম্পার মায়ের প্যাকেট আমাদের অফিসে পড়ে আছে কিন্তু আমরা কোন রিলায়েবল লোক পাচ্ছি না, চম্পার মায়ের শাড়ি-ব্লাউজ যাকে তাকে দিয়ে পাঠানো যায় না, হারিয়ে গেলে অনিবার্য বিপদ মহিলা অফিস মাথায় তুলবে।

মাথায় তুলতে অবশ্য বাকি কিছু রাখেনি। তিনি প্রায় প্রতিদিন সকাল বিকাল ফোনে খবর নিয়ে যাচ্ছেন তার শাড়ি ব্লাউজের কোন গতি হলো কি না। রিলায়েবল লোক না পাওয়া পর্যন্ত ওগুলোর গতি করা যে সহজ না সে কথা আমাকে নানা ভাবে এক্সপ্লেন করতে হয়, বুড়ো মানুষ কানেও কম শোনেন তাই আমাকে এক কথা তিনবার করে বলতে হয়। কালা মানুষকে ফোনে কোন কথা বোঝানো ভীষন যন্ত্রণার ব্যাপার এর চেয়ে বোবা অনেক ভাল। আমি এ পাশ থেকে তাকে ফোনে আশ্বস্তের বার্তা পাঠাই, বলি - কালাম ভাই যাওয়ার কথা খুবই বিস্বস্ত লোক ভাবছি ওনার যাওয়া কনফার্ম হলে ওনার সঙ্গে দিয়ে দেব।

উনি ওপাশ থেকে বলেন - কাশেমটা কে, সে এখানে কি করে, বাংলাদেশে তার ঠিকানা বাড়ি-ঘর কোথায়? সে কি বিবাহিত না অবিবাহিত? বিবাহিত হলে শাড়ি-ব্লাউজ সঠিক গন্তব্যে পৌঁছবে কাশেম সাহেবের ওয়াইফ ওগুলো গায়েব করে দেবে, কারণ ওরকম ঝর্জেটের শাড়ি ঢাকায় নেই আপনি বরং অবিবাহিত কাউকে দেখুন খবরদার ওগুলো যেন কোন মহিলার হাতে না পড়ে, আমাকে কাশেম সাহেবের ফোন নাম্বারটা দিন আমি কথা

বলে দেখি হাউ রিলায়েবল হি ইজ !.....

চম্পার মায়ের এই শাড়ি ব্লাউজ নিয়ে আমি বেশ স্ট্রেসে পড়ি গেছি খামাখা একটা উটকো ঝামেলা কাঁধে নেয়া। মাহিলার ফোন এলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফোন এটেন্ড করতে পাড়ি না। শেষে বাধ্য হয়ে আমাদের রিসিপশনের মেয়েটাকে বলে দিলাম চম্পার মায়ের ফোন এলে বলবে আই এম অন লিভ আর মোবাইল নাম্বার চাইলে বলবে আমি মোবাইল ইউজ করি না।

এতে ঝামেলা কমলো না বরং বেড়ে গেল, চম্পার মা অফিসের বদলে বাসায় ফোন করা শুরু করলো। আমার ওয়াইফ রেগে আগুন; বাড়ি ফিরতেই বলে - মিসেস রাশিদাটা কে?

আমি আকাশ থেকে পড়লাম, এ নামের কাউকে আমি চিনি না। আমার আকাশ থেকে পড়া ভাব দেখে টিনা ঠোঁট উল্টে বলে - মিসেস রাশিদা হচ্ছেন সেই মহিলা যার ব্লাউজ নিয়ে তুমি টানাটানি করছো, মহিলা তিনবার বাসায় ফোন করেছে এবং জানতে চেয়েছে ওগুলো তুমি কবে ঢাকায় পৌছে দিচ্ছ....রাত ন'টায় উনি আবার ফোন করবে।

আমি কেবলা কান্ত মার্কা হাসি ফুটিয়ে বলি - ও চম্পার মা ! তাই বলো ওনার নাম মিসেস রাশিদা? জানতাম না তো !

মহিলা যা বয়স তাতে সহজেই আন্টি বলা যায় আমি দু'একবার ট্রাই করে দেখেছি আমি আন্টি বললেও উনি আমাকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করেন। দু'বার আন্টি বলার পর কেউ যদি পাঁচবার ভাই বলে তাহলে আন্টি আর আন্টির পর্যায়ে থাকে না বুঝে নিতে হবে উনি আন্টির বৃত্তে থাকতে চান না বৃত্ত ভাঙ্গতে চান। সম্ভবত উনি টিনাকেও ভাবি বলে সম্বোধন করেছে। টিনা খুব খুঁতখুঁতে ধরনের মেয়ে একবার মাথায় কিছু ঢুকলে ওটা কম্পিউটার ভাইরাসের মতো আমার সব ফাইল ডাটা-ফাটা এলোমোলো করে দেবে, ভাইরাস মাদার বোর্ড ঢুকে যাবার আগেই আমাকে ক্লিয়ার করে ফেলতে হবে।

আমি টিনাকে চম্পার মায়ের শাড়ি-ব্লাউজের সব ইতিবৃত্ত খুলে বললাম। টিনা খুব একটা আস্বস্ত হয়েছে বলে মনে হলো না, তার চোখ-মুখ আরো শক্ত হয়ে গেল। আমার এক্সপ্লেশন শেষে সে গম্ভীর মুখে জানতে চাইলো - চম্পাটা কে? তের বার তুমি 'চম্পার মা' 'চম্পার মা' বলেছো....

আমি ঘেমে গেলাম - ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে যে ঘাম হয় সে রকম না মরুভূমিতে গনগনে সুর্যের নীচে কুলকুল করা ঘাম, আমার মনে হলো আমি মাকরসার জালে জড়িয়ে গেছি যতই খুলতে চাচ্ছি ততই বেশি করে জালে জড়াচ্ছি। কিছু কিছু ব্যাপারে নারীকে অন্ধকারে রাখতে হয় আলো দেখালে বিপদ, আলো আঁধারি আরো বিপদ। এখন ব্যাপারটা অন্ধকার থেকে আলো আঁধারিতে এসে পৌছছে, আমি ৫০০ পাওয়ারের আলো জ্বালবার সুইচ খুঁজতে থাকি ১০০ কিংবা ২০০ পাওয়ারে কাজ হবে না। আমি টিনার সাথে চম্পার গল্প শুরু করি।

চম্পার সাথে আমার প্রথম আলাপ হয় সোসাইটির এক অনুষ্ঠানে, নির্ধারিত উপস্থাকের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠান চালানোর জন্যে হঠাৎ আমাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। চম্পা ছিল সেই আসল উপস্থাপকের সহকারিনী। আজকাল আসল জিনিসের চেয়ে ফেক জিনিসের কদরও কম নয় - চায়না এমন সব জিনিস বানাচ্ছে হাতে নিলে কাষ্টমাররা কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে কোনটা আসল আর কোনটা ফেক। টেইকই একটু কম আর লাইসেন্সের আলাই বালাই নেই এই যা ফারাক। অপারেইটিং সিষ্টেম থাক, আজকাল ক'জনই বা লাইসেন্স নিয়ে মাইক্রোসফট অফিস ইউজ করে !

দেড় ঘন্টার অনুষ্ঠানে আমি নকল উপস্থাপক হিসেবে ভালই টিকে গেলাম। এটা দশ বছর আগের ঘটনা, তখন আমি সবে সিঙ্গাপুরে পা দিয়েছি, এর পর সোসাইটির আরো অনেক অনুষ্ঠানে, রিহার্সালে চম্পার সাথে দেখা-সাক্ষাত কথা-বার্তা হয়েছে কিন্ত ঘনিষ্ঠতা বা বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝায় সে রকম কিছু হয়নি। না হবার যথেষ্ট কারণও ছিল।

আমার জন্ম মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিতে, আমি আমার ফ্যামেলির বড় সন্তান। বড় হলে কিছু দায়-দ্বায়িত্ব এমনিতেই বেশি থাকে, এখানে পড়াশুনা করতে এসে আমি যা খুশি তাই করতে পাড়ি না; স্পেশালি প্রেম-ট্রেম। প্রেমে কেউ পাজ্ঞ হয় কেউ আবার দেউলিয়া হয়। আমার দেউলিয়া হয়ে যাবার সম্ভবনাই বেশি ছিল, তাই ওপথে পা আর

এগুইনি।

চম্পরা ১৯৭৩ এ হয়ে এখানে চলে আসে, ওর বয়স ছিল তখন পাঁচ বছর। এরপর থেকেই ওরা এখানেই সেটেল্ড হয়, পাসপোর্ট বদলে এদেশের নাগরিকত্ত নেয়। চম্পার বয়স যখন পনের তখন ওর বাবা মারা যায়, মা একটা চাকরি নিয়ে সংসারের হাল ধরে। দক্ষ নাবিকের মতো চম্পার মা বছরের পর বছর কঠিন সময় পাড় করেন। পরিবারের কর্তা মারা গেলে সংসারে যে কত বড় দূর্যোগ নেমে আসে তা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানেন।

১৯৯৫ সালে আমরা যখন সোসাইটিতে আনাগোনা করি তখন চম্পার বয়স সাতাশ আমার চেয়ে দু'বছরের বড়। এ বয়সে বাঙালী মেয়েরা দু'তিনটা সন্তানের মা হয়ে যায়। চম্পার তখনো বিয়ে হয়নি - বিদেশে মেয়েরা একটু দেরীতেই বিয়ে করে এখানে কেরিয়ারটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, ছেলে মেয়ে সবাইকে কাজ করতে হয় বলে রুটিরুজির সংস্থানটাই আসল। হাউজ ওয়াইফ হলে ভিন্ন কথা 'পেটে খেলে পিঠে সয়' এ রকম একটা বচন তো আগে থেকেই চালু আছে। বিদেশে মেয়েদের স্বাধীনচেতা হবার মূখ্য কারণটি হলো কেরিয়ার, নিজের পায়ে নিজে ভর দিয়ে দাঁড়ায়।

সাজলে সব মেয়েকেই সুন্দর দেখায়, চম্পা তখন খুব সাজ-গোজ করতো নেশা ধরানো সাজ - বার বার তাকিয়ে থাকার নেশা। আমি কেন যেন নেশাগ্রস্থ হতে পারি না, সব নেশাই দ্রুত কেটে যায়। আমার নেশার লাটিম ঝিম ধরার আগেই কাত হয়ে পড়ে যায়। শাহিন নামে আমাদের এক আর্কিটেক্ট বন্ধু চম্পার নেশা ধরানো সাজে মজে গেল। শাহিনের গানের গলা খুব ভাল ছিল রিহার্সালে চম্পা ওর গান শুনে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকত অনেকটা রবিন্দ্রনাথের গানের মতো - মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে.....

ওদের প্রেম দইয়ের মতো জামাটবদ্ধ হবার আগেই চম্পার মা বাঁধ সাধলো। ভারত গঙ্গায় যেমন বাঁধ দিয়েছে সে-রকম কঠিন বাঁধ। একমাত্র মেয়েকে তিনি গঙ্গার জলের মতো অবাঁধে ছেড়ে দিতে পাড়েন না; মেয়ের ওপর তার অধিকারই বেশি কিংবা কে জানে তিনি হয়তো ভেবেছেন বিয়ের পর মেয়ে তার পর হয়ে যাবে। মেয়ে অন্য কোথাও চলে গেলে কে তাকে দেখভাল করবে ! ছোট একটা ছেলে আছে তার মাথার ঠিক নেই বছরে ছ'মাস তাকে মেন্টাল হসপিটালে রাখতে হয়।

তিন বাঙালী একসঙ্গে হলে চারটা সোসাইটি হয়। বাঙালীরা কেন যেন একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে না, বাঙালীরা পৃথিবীর যেখানেই গেছে সেখানেই এ সমস্যা - জিয়া দল, মুজিব দল, জামাত দল, জাসদ-বাদস তবলিগার নানা মতের নানা বায়োনাক্কা। তার ওপর আবার আছে সিলেট-নোয়াখালি, দাউদকান্দি-নরসিন্দি, মুন্সিগঞ্জ-নারায়াণগঞ্জ প্রীতি। এটা বোধহয় একটা জিনগত ব্যাপার। এখানেও সোসাইটি ভেঙ্গে গেল। ভালই হলো আমরা বৈষয়িক উন্নতিতে মনযোগি হলাম। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ পোষ্ট গ্রেজুয়েট করার জন্যে ঝুঁকে পড়লো, কেউ অফিসে ওভারটাইম কিংবা অন্য কোথাও পার্টটাইম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো কেউ আবার বিয়ে টিয়ে করে সন্তান উৎপাদনে ব্রতী হলো।

সহজ বলে আমিও শেষ পথটাই বেছে নিলাম। কারণ, বাংলাদেশে আমার প্রেমিকাটির ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম। শাহিন এখানকার পাঠ চুকিয়ে চলে গেল নিউজিলেন্ডে। ও সেখানে একটা ভাল যবের অফার পেয়েছে, ওর বড় ভাই আবার ওখানকার ডাক্তার।

চম্পার সাথে কদাচিৎ দেখা হয় সোসাইটির কিংবা এমবেসির কোন অনুষ্ঠানে, দেখা মানে দূর থেকে দেখা । চম্পা আর আগের মতো বর্ণাঢ্য ভাবে সাজে না, নেশা ধরানো রূপটিও যেন নেই - চোখের কোনে কালি পড়েছে একটা রোগা রোগা ভাব নিয়ে এককোনে বসে থাকে।

চম্পা মনে হয় ইচ্ছে করেই আমার সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলে, চোখে চোখ পড়লে দ্রুত অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। আগ বাড়িয়ে আমিই বা কাছে যাই কি করে সঙ্গে সবসময় জোকের মতো টিনা লেগে থাকে। টিনাকে চম্পার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া যায় কিন্তু এরপর আমাকে টিনার একগাদা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হবে, খামাখা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিকে জাগিয়ে লাভ কি! কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝামেলা তো বাঁধলই এখন আর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। কেন যে আমি চম্পার মায়ের শাড়ি-ব্লাউজের দ্বায়িত্ব নিতে গেলাম ! আমি এখন যে

মাকড়সার জালে জড়িয়েছি তার থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। খুব নির্বিঘ্নে সে কাজটা সমাধা হবে বলে মনে হয় না। চম্পা সম্পর্কে এত সাত কাহনের পড়েও টিনার সন্দেহের ঘোর কাটে না, সে আমাকে জিজ্ঞেস করে - তোমার চম্পা এখন কোথায়?

এবার আর ঘাম নয় আমি কেঁপে উঠি আমার চারপাশটা কেমন অন্ধকার মনে হয় ৫০০ পাওয়ারের আলোতে কাজ হচ্ছে না আমাকে ১০০০ পাওয়রের আলো জ্বেলে সব ফকফকা করে দিতে হবে। আমি আমতা আমতা করে বলি - চম্পা এখন আমেরিকায় থাকে ওর মামার ওখানে.....যাবার সময় এয়ার টিকেটটা আমাদের অফিস থেকে নিয়েছিল।

টিনা বলে - কতদিন আগে সেটা?

তিন বছর তো হবেই।

টিনা পিন্চ করে বলে - তোমার তো জানি মন-ভোলা স্বভাব....নিজের বউয়ের বার্থ ডে, মেরেজ ডে সব ভুলে যাও....এদিকে চম্পার চলে যাবার দিন তারিখ তো দেখছি একেবারে মুখস্ত করে রেখেছ, ই-মেলে যোগাযোগ রাখ নিশ্চয়ই?

আমি মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বলি - না কোন যোগাযোগ নেই, থাকলেও দোষের কিছু নেই। মনে রাখার একটা বিশেষ কারণ হলো চম্পা চলে যাবার দিনটি ছিল মন্টির সেকেন্ড বার্থ ডে, সেদিন সকালে এসে আমদের অফিস থেকে টিকেটটা কালেক্ট করেছিল....যাবার সময় আমার ডেস্কে মন্টির যে ছবিটি ছিল সেটা নিয়ে গেছে।

টিনা আঁৎকে ওঠে বলে - মন্টির ছবি ! তুমি দিলে ! কেন?

আমি বলি - এই মেয়েটির হয়তো নিজের জীবন নিয়ে অনেক স্বপ্ন-সাধ ছিল....ঘর বাঁধার স্বপ্ন....সন্তানের স্বপ্ন.....ও জেনে গিয়েছিল সে সব স্বপ্ন-সাধ আর পুরণ হবার নয়। শাহিন চলে যাবার অনেক বছর পর রুহুল আমিনকে ইন্ট্রোডিউজ করিয়ে দিয়েছিলাম চম্পার সাথে। রুহুল আমিনকে তো চেন? আমরা একসঙ্গে মুজিব হলে থাকতাম....সেই যে একবার সিঙ্গাপুরে এসে কিছুদিন ধান্ধা-ফান্ধার চেষ্টা করল....তখন। হয়েছিল কি - আমি আর রুহুল আমিন আমাদের অফিসের কাছে এক রেষ্টুরেন্টে বসে লাঞ্চ করছিলাম হঠাৎ দেখি চম্পা দরজা ঠেলে সে রেষ্টুরেন্টে ঢুকছে, একটা কো-ইনসিডেন্ট বলতে পাড়। তখনই ঠিক করলাম এই কো-ইনসিডেন্টটা কাজে লাগাতে হবে। চম্পাকে ডেকে আমাদের টেবিলে বসালাম, পরিচয় করিয়ে দিলাম রুহুল আমিনের সঙ্গে। লাঞ্চ শেষে রুহুল আমিনকে বললাম চম্পকে ট্রেন-ষ্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে, ট্রেন-ষ্টেশন কাছেই এগিয়ে দেবার কোন দরকার ছিল না। কাজটা করেছিলাম ইচ্ছে করেই - যদি দুজনের একটা গতি-ফতি হয় এই আর কি। রবিন্দ্রনাথ নাকি কাব্য চর্চার ফঁকে দু'একটা ঘটকালিও করেছেন অবলাকে বিয়ে দিয়েছেন তাঁর বন্ধু জগদীশ চন্দ্র বসুর সঙ্গে, আমার চেষ্টা করতে দোষ কি?

দু'তিন দিন ডেটিং করার পর রুহুল আমিন অফিসে এসে বলে - দোস্ত কাজ হবে না। আমি বলি কেন, সমস্যা কোথায়?

রুহুল আমিন মুখ বেঁকিয়ে বলে - দোস্ত মাইয়া তো বুড়া, ১৯৬৭ তে জন্ম আমার চাইতেও দেড় বছরের বড়....এই রকম বাত্তি মাইয়া বিয়া করলে মায় বাড়িত জায়গা দিব না।

আমি বলি - তুই তো আর মেয়েকে নিয়ে বাংলাদেশে থাকবি না, থাকবি তো শ্বশুড় বাড়ি, এই মিন শ্বশুড় তো নেই শ্বাশুড়ির বাড়িতে থাকবি। ছেলাটা যেহেতু মেন্টালি ডিজএবেল আফটার অল তুইই হবি অল ইন অল....তোর একটা ভাল চাকরি-বাকরি হয়ে গেলে মাসে মাসে ডলার পাঠাবি তোর মাকে, ব্যাস।

আমিন হেসে বলে - কাজ হবে না দোস্ত শ্বাশুড়ি মহা-টেরর।

বুঝলি কি করে?

আমিন বলে - চম্পা অর মা'র লগে পরিচয় করাইতে জোর কইরা বাসায় নিয়া গেল । চম্পার মা জিগায় - ঢাকা শহরে বাড়ি কয়টা? কথা শুইনা আমার হালায় মেজাজ খারাপ হয়া গেল। আমি কই - বাড়ি ঘর নাই আন্টি বেকার যুবক, যখন যেইখানে অপারেশনে যাই সেইখানেই চিৎ হইয়া পইড়া থাকি। অখন সিঙ্গাপুরের অপারেশনে আছি সুযোগ পাইলেই চিৎ হয়া যাব। আমার কথা শুইনা চম্পার মা কয় - আমার এইখনে

চিৎ-কাইতের কোন ব্যবস্থা হইব না তুমি অন্য পথ দেখ, খবরদার আমার মাইয়ার লগে যেন তোমারে আর না দেখি।

চম্পা কি বলল?

চম্পা আর কি বলবে ! সে আপসেট, আর আমিও ডিসাইড করছি - এইখানে কাইত-চিৎ হওয়া যাবে না....এই মাইয়া চলবে না দোস্ত, চুলে পাক ধরছে....বিয়ার পর বউয়ের সাদা চুল বাছতে বাছতে আমার জান শেষ হইব.....

টিনা প্লাগ করা ভ্রু-জোড়া কুঁচকে বলে - তুমি চম্পাকে মন্টির ছবিটা দিলে কেন?

আমার ডেস্কে মন্টির একটা ছোট্ট ছবি ছিল, টিকেটটা নেবার সময় চম্পা বললো - আপনার ছেলেটা খুব কিউট আমার তো আর কখনো ঘর-সংসার হবে না....আমেরিকায় যাচ্ছি কখনো ফিরি কিনা ঠিক নেই, আমি কি আপনার ছেলের এই ছবিটা নিতে পাড়ি? ...আমি ছবিটা দিয়ে দিয়েছি জিজ্ঞেস করিনি কেন ও ছবিটা নিতে চেয়েছিল, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়নি আমি কি কাজটা অন্যায় করেছি?

টিনা খানিকক্ষণ আমার মুখের দিয়ে চেয়ে রইল, কি বুঝে ছিল কে জানে.... কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল - চম্পার সঙ্গে আবার কখনো দেখা হলে বাসায় ইনভাইট করো.....

আমার ঘাম দিয়ে জ্বর সেরেছিল আমি তখনকার মতো জাল কেটে নিবিঘ্নে বেরুতে পেড়েছিলাম। চম্পার মায়ের সেই শাড়ি-ব্লাউজ শেষ পর্যন্ত আমাকেই ঢাকায় নিয়ে যেতে হয়েছিল। কি এক জরুরী কাজে তখন আমারই যাবার দরকার হয়ে পড়েছিল। শান্তি নগরে একটা জীর্ণ বাড়িতে থাকতেন চম্পার খালা ডায়াবেটিকের পেশান্ট, চোখের জ্যোতি মরে গিয়েছিল। সেই জ্যোতিহীন চোখে তিনি প্রবাসী বোনের শাড়িতে কাজ করে দিয়েছিলেন। চম্পার সেই খালা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, চম্পার মায়ের ঢাকায় আর কোন আত্মজন নেই, আশ্রয় নেই...এ-কথা ভাবতেই আমার মন খারাপ হতে শুরু করে।

চা শেষ করে চম্পার মা বলে - আমার সবুজ ডাইরীটা কি এসেছে? পায়ে ব্যাথা তো হাঁটা-চলায় খুব সমস্যা হয়....এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম আমার ডাইরীটা এলো কিনা দেখি....বার বার তো আসা যায় না....

আমি চমকে উঠি.....সবুজ ডাইরী ! তাই তো, বছর যে শেষ হয়ে এলো ! বছরান্তে বিভিন্ন এয়ারলাইন্স-ব্যাংক-ইনসিওরেন্স কোম্পানী থেকে আমরা ডাইরী, কেলেন্ডার পেয়ে থাকি। চম্পার মা আগে থেকেই ছোট্ট মেয়ের মতো বায়না ধরে থাকে....তার জন্যে যেন একটা সবুজ রঙের ডায়রী রাখা হয়। সব সময় আমরা যে সবুজ রঙের ডাইরী পাই না নয়, গত বছর তাকে যে ডাইরীটা দিয়েছি তার রং ছিল কালো। সে ডাইরী হাতে নিয়ে তিনি মন খারাপ করেছেন।

আমি ড্রয়ার খুলে তার জন্যে রাখা ডায়রীর প্যাকেটটা এগিয়ে দেই। প্যাকেট খুলে তিনি শিশুর মতো উচ্ছসিত হয়ে ওঠেন। একজন বয়স্ক মানুষের এরকম উচ্ছাস দেখতে আমার খুবই ভাল লাগে, আমার এক বছর বয়সী মেয়েটি নতুন কোন খেলনা পেলে এরকমই উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

ডাইরীটার রং সবুজ এজন্যেই চম্পার মায়ের এরকম আনন্দ হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করি সবুজের প্রতি আপনার এতো মোহ কেন?

চম্পার মা বলে- এ আমার দেশের পতাকার রং.....

আনন্দে চম্পার মায়ের চোখের কোনে পানি চিক চিক করছে মুক্তোর মতো। চম্পার মা বোধহয় ভুলে গেছেন তিনি এখন সিঙ্গাপুরের নাগরিক কিন্তু তার অবচেনত মন বুঝি পড়ে আছে সেই সবুজ ঘাসের দেশে। চম্পার মায়ের ছোট্ট ভুলটুকু আমার শুধরে দিতে ইচ্ছে করে না।

প্রথম প্রকাশ ‘অন্যদিন’ ঈদুল আজহা সংখ্যা ২০০৪